ভারতের ইতিহাসে অনগ্রসর ও অবহেলিত জনসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে আমবেদ্‌কার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। পাণ্ডিত্যের ঔজ্জ্বল্যে এবং বৌদ্ধিক বিচক্ষণতায় আমবেদ্‌কার বিশিষ্ট। এই সুবাদে ভারতব্যাপী, বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রে সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে তিনি এক বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেন। সুদীর্ঘকাল ধরে উপেক্ষিত এই ভারতীয় জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র স্বার্থ সংরক্ষণ ও সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে ভাবনা-চিন্তা করেছেন। পিছিয়ে-পড়া এই সমস্ত জনসম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করার জন্য তিনি রাজনীতিক ও আর্থনীতিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এবং এ ক্ষেত্রে তিনি সুসংহত উদ্যোগ-আয়োজনের উপর জোর দেন। শাসনতান্ত্রিক সংস্কারমূলক বিভিন্ন আইন প্রণয়নের প্রাক্কালে আমবেদ্‌কার রাজনীতিক ও সামাজিক অধিকারসমূহের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের উপর জোর দিয়েছেন। অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য তিনি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং আসন সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন। সমকালীন ভারতের অচ্ছ্যুৎ শ্রেণীসমূহের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের উপযোগী উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের নির্বিকার ভূমিকায় তিনি ছিলেন ক্ষুব্ধ। ব্রিটিশ সরকারের এই নির্লিপ্ততার বিরুদ্ধে আমবেদ্‌কার প্রতিবাদী সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। ১৯৩০ সালে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে

দলিত মানুষের প্রতিনিধি

আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুসারে ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে জাতিগত স্তরবিন্যাস সামাজিক ও আর্থনীতিক বিচার-বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতিভেদ প্রথাকে ধর্মীয় বিচার-বিবেচনার সঙ্গে সংযুক্ত করা অনুচিত। জাতিভেদ প্রথাকে ধর্মীয় সমর্থন প্রদান হিন্দুধর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্করহিত। জাতিভেদ ব্যবস্থা হিন্দুধর্মের মূল বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিসূচক নয়। হিন্দুদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন না, বেদকে মানেন না; অথচ তাঁরা নিজেদের হিন্দু হিসাবে পরিচয় দেন। সামাজিক একটি বিশেষ শ্রেণীকে ধর্মীয় ভিত্তিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দেওয়ার ফলে হিন্দু জনসম্প্রদায়ের প্রভূত ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। দলিত শ্রেণীর বহু মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছেন। তাঁরা খ্রীস্টান ধর্ম বা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। জাতিভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতামূলক আচরণ ভারতীয়দের এবং ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে। আমবেদ্‌কারের এই অভিমত ভারতীয়দের বিবেকবোধকে নাড়া দিয়েছে।

জাতিভেদ প্রথা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত

আমবেদ্‌কারের মতানুসারে ভারতে জাতিভেদ প্রথার পরিপ্রেক্ষিতে পেশাগত সামাজিক স্তরবিন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের স্তরবিন্যাস সমাজজীবন বা জনজীবনের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। কারণ হিন্দু সমাজব্যবস্থায় সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা ও নিয়ম-নিষেধের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। তার ফলে ব্যক্তি-মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রবণতা পদদলিত হয়। ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে মানব সমাজ গঠিত এ ধারণা গতানুগতিক। আসলে সমাজ গঠিত হয় বিভিন্ন শ্রেণীকে নিয়ে। সামাজিক, আর্থনীতিক ও বৌদ্ধিক ভিত্তির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের অন্তর্ভুক্ত শ্রেণীসমূহের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু সমাজের প্রত্যেকেই এ রকম কোন-না-কোন শ্রেণীর সদস্য। এই ব্যবস্থা ব্যতিক্রমহীন। কিন্তু হিন্দু সমাজে এই শ্রেণীবিন্যাস জাতিভেদ প্রথায় পরিণতি লাভ করেছে। আদিতে জাতি ছিল একটাই। কালক্রমে অনুকরণ ও বহিঃষ্করণের মাধ্যমে শ্রেণীসমূহ বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছে। শ্রমবিভাজনের ব্যবস্থা ও নীতি সকল সভ্য সমাজেই স্বীকৃত। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু হিন্দু সমাজে জাতিভিত্তিক শ্রমবিভাজনের ব্যবস্থাকে একটি অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা হিসাবে অনুমোদন করা হয়েছে। হিন্দু সমাজে এক-একটি জাতি স্বতন্ত্র একটি সাংস্কৃতিক এককে পরিণত হয়। আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুসারে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার এই চেহারা চরিত্র অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা

জাত-পাতভিত্তিক হিন্দু সমাজব্যবস্থার পিছনে ধর্মীয় ও নৈতিক অনুমোদন বর্তমান। হিন্দু সমাজের দুর্বলতার মূল কারণ এর মধ্যেই নিহিত আছে। এই কারণে খ্রীস্টান ও মুসলমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সমাজের দুর্বলতা প্রতিপন্ন হয়। হিন্দু সমাজের এক শ্রেণীর মানুষকে যাবতীয় মানবিক অধিকার থেকে স্থায়িভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং তাদের উপর যাবতীয় দায়িত্ব পালনের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অস্পৃশ্যতার ছাপ লাগিয়ে দিয়ে তাদের জন্য সকল রকম মানবিক সুযোগ-সুবিধাকে অস্বীকার করা হয়েছে। হিন্দু সমাজের উচ্চ বর্ণের মানুষেরা সকল রকম সুযোগ-সুবিধা, বিশেষাধিকার ও অব্যাহতি ভোগ করে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আবার

সমাজের তথাকথিত অচ্ছ্যুৎ সম্প্রদায়ের মানুষের উপর সকল রকম অন্যায় ও অমানবিক আচরণের অধিকারও ভোগ করে। আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুসারে হিন্দু ধর্ম সর্ব বিষয়ে বিশেষভাবে উদার প্রকৃতির। অথচ এই ধর্মে অস্পৃশ্য বলে সমাজের একটি শ্রেণীকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও অচ্ছ্যুৎ করে রাখা হয়েছে। সমাজের একটি শ্রেণীকে এইভাবে অচ্ছ্যুৎকরণের বিষয়টি হিন্দু ধর্মের অনুমোদন লাভ করেছে। অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত এই শ্রেণীটির ব্যক্তিবর্গকে মানুষ হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয় নি। সমাজের অন্য সকলের সঙ্গে তারা মেলামেশার অযোগ্য বলে মনে করা হয়। হিন্দু সমাজে এইভাবে চ্ছ্যুত-অচ্ছ্যুৎ বিভাজন অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। সামাজিক ও আর্থনীতিক বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণীবিন্যাস পৃথিবীর সকল দেশেই দেখা যায়। মানবসমাজের শ্রেণীভিত্তিক গঠন নতুন কোন বিষয় নয়। সকল দেশের সমাজব্যবস্থার সাংগঠনিক ক্ষেত্রে শ্রেণীগত বিন্যাস বর্তমান। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু হিন্দু সমাজব্যবস্থায় জন্মগত বিচারে শ্রেণীবিন্যাস বর্তমান। এবং এই শ্রেণীবিভাজন ধর্মীয় অনুমোদনপ্রাপ্ত। হিন্দু সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের পিছনে ধর্মীয় অনুমোদনের উপস্থিতি সমগ্র বিষয়টিকে অধিকতর জটিল করে তুলেছে। হিন্দু ধর্মই সমাজের সকলের মুক্ত জীবনযাপন এবং সামাজিক সচলতার পথে একটি বড় প্রতিবন্ধক হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। এই হিন্দু ধর্মই সমাজের কিছু মানুষকে অচ্ছ্যুৎ বলে চিহ্নিত করে দিয়েছে এবং সমাজে সমানাধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করেছে। হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা ধর্মীয় অনুমোদনের ভিত্তিতে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। শিক্ষার বিস্তার, সামাজিক সংস্কার বা সাম্যের শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতির মাধ্যমে এই জাতিভেদ প্রথার অবলুপ্তি অসম্ভব।

সমানাধিকারের অস্বীকৃতি

হিন্দু সমাজব্যবস্থায় সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব একেবারে অনুপস্থিত। অসাম্যের ভিত্তিতে এই সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। সামর্থ্য ও গুণগত যোগ্যতা নির্বিশেষে এই সমাজে জাতিগত বিচারে ব্যক্তির বৃত্তি নির্ধারিত হয়। এবং জাতিগত বিচারে বৃত্তির এই বিন্যাস অপরিবর্তনীয়। সামাজিক জীবনে অসাম্যই হল হিন্দু সামাজিক সংগঠনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তির স্বাধীনতা এ ক্ষেত্রে অস্বীকৃত। বলা হয় যে প্রজাপতি ব্রহ্মা সকল মানুষের স্রষ্টা। এতদ্‌সত্ত্বেও হিন্দু সামাজিক সংগঠনে সাম্যের নীতি অস্বীকৃত। হিন্দু সমাজে ব্যক্তি-মানুষের বৌদ্ধিক ও প্রকৃতিগত স্বাভাবিক পার্থক্যের উপর কোন রকম গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। মানুষের জন্মগত বা জাতিগত পার্থক্যের উপর যাবতীয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। হিন্দু ধর্মের ভাষ্য অনুসারে ঈশ্বরই সকলের স্রষ্টা, কিন্তু সকলকে তিনি সমান করে সৃষ্টি করেননি। সামাজিক জীবনে অসাম্য হল হিন্দু সামাজিক সংগঠনের মৌলিক নীতি। এখানে বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থার উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এখানে বর্ণ ও জাতির গুরুত্বই অধিক। আদিতে ছিল চতুর্বর্ণ। আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী বর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে হয়েছে পাঁচ। অস্পৃশ্য জনসম্প্রদায় পঞ্চম বর্ণ হিসাবে সংযুক্ত হয়েছে। প্রতিটি বর্ণের অন্তর্ভুক্ত জাতিগোষ্ঠীসমূহ আবার বিভিন্ন উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণদের মধ্যেই বিভিন্ন বিভাজন বর্তমান। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা-প্রকরণ, বৈবাহিক বিধি-ব্যবস্থা, খাদ্যাখাদ্যের বাছ-বিচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রভূত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতই হিন্দুরা একটি সুসংহত জনসম্প্রদায় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি। জাতিভেদ প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সমাজে ব্যক্তি-মানুষের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও বিশেষাধিকারসমূহ জাতিগত বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়; মানুষের সামর্থ্য-অসামর্থ্য বা গুণগত যোগ্যতা-অযোগ্যতা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন প্রতিপন্ন হয়।

জাতিভেদ প্রথার প্রাধান্য

হিন্দু সমাজের এই জাতিভেদ প্রথা সংরক্ষণেরও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অতীতে ছিল। বর্ণ ও জাতিগত ভিত্তিতে স্তরবিন্যস্ত সামাজিক ব্যবস্থা সংরক্ষণের দায়িত্ব নৃপতিদের উপর ন্যস্ত ছিল।

নিম্ন বর্ণের মানুষ শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। অন্যান্য অধিকারের বিষয়েও তারা স্বাধীনভাবে চলতে পারত না, অথবা অস্ত্র ধারণ করতে পারত না। হিন্দু সমাজের এই জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও আর্থনৈতিক অবস্থান ও মর্যাদা চিরকালের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে নির্দিষ্ট ছিল। কোন রকম পরিবর্তন বা সমতাপ্রাপ্তির সুযোগ ছিল না। ধর্মীয় অনুশাসনের নামে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু মানুষের উপর অসম্মানজনক কিছু অবস্থা চিরকালের জন্য আরোপ করা হয়। হিন্দু সামাজিক সংগঠনের এই ব্যবস্থাকে ঈশ্বরীয় ও পবিত্র ব্যবস্থা হিসাবে মনে করার কথা বলা হত। সামাজিক সাম্যতার পথে এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা অবধারিত।

সামাজিক প্রকৃতি

আম্বেদকর হিন্দু সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুশীলন করেছেন। হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত তাঁর এই অনুশীলন বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আম্বেদকরের অভিমত অনুসারে প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু সমাজ হিসাবে কোন কিছুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। আসলে হিন্দু সমাজ হল কেবল কিছু জাতিগোষ্ঠীর সমাহার বিশেষ। এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন। হিন্দু সমাজ হল জাতিসমূহের এক ব্যবস্থা বিশেষ। এই ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রতিটি জাতির বিভিন্ন অধিকার ও উদ্দেশ্য বর্তমান। সুতরাং হিন্দুদের সমাজ হিসাবে অভিহিত করা যায় না। সমাজ হবে ব্যক্তিবর্গের একটি সংগঠিত ব্যবস্থা এবং সমাজের একটি সাধারণ উদ্দেশ্য থাকবে। হিন্দু সমাজের মধ্যে তা নেই। হিন্দু সমাজের তাত্ত্বিক আদর্শ এবং বাস্তব জীবনধারার মধ্যে বিশেষ ব্যবধান বর্তমান। হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতি উচ্চ মূল্যবোধ ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। সদ্ভাব-সম্প্রীতি, সহিষ্ণুতা, মানবিকতা, অহিংসা, মানবসেবা প্রভৃতি এই সমাজ-সংস্কৃতির মূল কথা। তাত্ত্বিক অনুমোদন সত্ত্বেও সামাজিক জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ন্যায়, স্বাধীনতা ও সাম্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। হিন্দুদের সামাজিক জীবনে অন্তর্নিহিত বিরোধিতার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। তাত্ত্বিক আদর্শ ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান হিন্দু সমাজের দুর্বলতা ও দুর্দশার মূল কারণ। এই কারণেই দীর্ঘকাল ধরে হিন্দুদের বিদেশী শক্তির পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করতে হয়েছে।

হিন্দু সমাজের সমাজ
ঠিক নয়

আম্বেদকরের অভিমত অনুযায়ী হিন্দু আইনে কোন অস্পৃশ্যকে ব্যক্তি হিসাবে স্বীকার করা হয় না। হিন্দু ধর্মে অস্পৃশ্যকে মানুষ হিসাবে স্বীকার করা হয় না, অস্পৃশ্যের সঙ্গে সংযোগ-সম্পর্ক অস্বীকৃত। অস্পৃশ্যদের উপর অমানবিক আচরণের অসংখ্য নজির আম্বেদকর তাঁর বিভিন্ন রচনায় তুলে ধরেছেন। উচ্চবর্ণের ডাক্তার অস্পৃশ্যতার অভিযোগে রোগীর চিকিৎসা করেন নি। অস্পৃশ্যতার কারণে বালককে ধর্মশালায় ঢুকতে দেওয়া হয় নি। অস্পৃশ্যতার কারণে দুর্দশাগ্রস্ত মহিলাকে সাহায্য করা হয় নি। অস্পৃশ্য জনসম্প্রদায়ের মানুষের বাসস্থানের উপর হিন্দু সমাজ নিয়ম-নিষেধ আরোপ করে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক-আশাক পরিধানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

অস্পৃশ্যদের উপর
অবিচার

আম্বেদকর বিশ্বাস করতেন যে, জাতিভেদ প্রথার বিনাশ সাধন ব্যতিরেকে অস্পৃশ্যতার অভিশাপের অবসান অসম্ভব। তাঁর মতানুসারে একই সামাজিক ব্যবস্থার অভিন্ন নীতির উপর জাতিভেদ ব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতার ধারণা প্রতিষ্ঠিত। জাতিভেদ প্রথা আছে বলেই অস্পৃশ্যতা আছে। এই কারণে আম্বেদকর উচ্চ-নিচ জাতিভেদ ব্যবস্থার অবসানের ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন। সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সকলের সমানাধিকারের উপর তিনি জোর দেন। দলিত জনসম্প্রদায়সমূহের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগঠনের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীগুলির পানীয় জলের অধিকার এবং মন্দিরে পূজার্চনার অধিকার আদায়ের জন্য আম্বেদকর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সামিল হন। এক্ষেত্রে 'কলা রাম মন্দির সত্যাগ্রহ', 'মহা ট্যাঙ্ক সত্যাগ্রহ', 'মনুস্মৃতি পোড়ান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্রের সত্যশোধক

মানবাধিকারের জন্য
আন্দোলন

আন্দোলনের নেতৃবর্গ এ বিষয়ে আমবেদ্‌কারের উদ্যোগ-আয়োজনকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন। মানবাধিকারের জন্য আমবেদ্‌কারের এই আন্দোলন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করে। জাতিভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতামুক্ত হিন্দু সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে আমবেদ্‌কারের উদ্যোগ-আন্দোলন বিনা বাধায় পরিচালিত হতে পারে নি। এ ক্ষেত্রে বর্ণ হিন্দুরা প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুসারে হিন্দু ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে অসাম্য-বৈষম্য বর্তমান। অসাম্য-বৈষম্যের এই নীতির মধ্যে আবার তারতম্য আছে। দলিত বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহ আবার সমগোত্রীয় নয়। তাদের মধ্যে ঐক্য বা সংহতি নেই। স্বভাবতই তারা হিন্দু সামাজিক সংগঠনের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে প্রতিবাদী আন্দোলনের সামিল হতে পারে না। ন্যায়সঙ্গত সামাজিক সংগঠনের স্বার্থে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সঙ্গে বা বৈশ্য শূদ্রের সঙ্গে একযোগে সংগ্রামের সামিল হতে সম্মত হয় না। আদর্শ সামাজিক সংগঠনের স্বার্থে আমবেদ্‌কার স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এবং এই কারণে তিনি হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন। চতুর্বর্ণের ব্যবস্থা সামাজিক সংগঠনের সর্বাধিক ক্ষতিকর বিষয়। চতুর্বর্ণ সমাজব্যবস্থাকে দুর্বল করে, পঙ্গু করে এবং মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমবেদ্‌কারের সুস্পষ্ট মতপার্থক্য ছিল। গান্ধীজি অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন নি। সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে আদর্শ ব্যবস্থা হিসাবে চতুর্বর্ণকে মহাত্মা গান্ধী সমর্থন করেছেন। চতুর্বর্ণের পারস্পরিক মানবিক সম্পর্কের ইতিহাসের দিকে তিনি তাকান নি। চতুর্বর্ণের সামাজিক জীবনধারায় পারস্পরিক সদ্ভাব-সম্প্রীতি বা সহযোগিতার সম্পর্ক কখনই ছিল না। সামাজিক ক্ষেত্রে চতুর্বর্ণের মধ্যে অসদ্ভাব ও অসহযোগিতা অব্যাহত ছিল। অধ্যাপক ড. ভর্মা এ বিষয়ে বলেছেন : "According to Ambedkar, the Hindu scheme of social structure based on the four Varnas or Chaturvarna breeds inequality and has been the parent of the caste system and untouchability which are merely forms of inequality."

চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বিরোধিতা

আমবেদ্‌কার চতুর্থ বর্ণ হিসাবে শূদ্র বর্ণের উৎপত্তির ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতানুসারে আদিতে প্রথম তিনটি বর্ণ ছিল। চতুর্থ বর্ণ হিসাবে শূদ্ররা ছিল না। এ বিষয়ে আমবেদ্‌কার হিন্দু ধর্মশাস্ত্রসমূহ এবং হিন্দু সমাজব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন গভীরভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতানুসারে নিজেদের কায়েমী স্বার্থের অনুকূলে জাতিভেদ প্রথাকে সুদৃঢ় করার জন্য ব্রাহ্মণরা যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেছে। আদিতে হিন্দু সমাজ কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণরা হিন্দু সমাজের এই শ্রেণীবিন্যাসকে বিকৃতির এক নতুন মাত্রা প্রদান করেছে। আমবেদ্‌কার বলেছেন যে, ঋগ্বেদে মাত্র তিনটি বর্ণের কথা বলা হয়েছে। এই তিনটি বর্ণ হল— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য। ঋগ্বেদে শূদ্রবর্ণের কোন উল্লেখ নেই। 'সতপথ ব্রাহ্মণ'-এও স্বতন্ত্র একটি বর্ণ হিসাবে শূদ্রবর্ণের কথা বলা হয় নি। ব্রহ্ম পুরাণে শূদ্রদের একটি আদিবাসী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আদিবাসী গোষ্ঠীটি বিন্ধ্যাঞ্চলের উপরে বসবাস করত। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠানে শূদ্র নৃপতিদের আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। অর্থাৎ শূদ্রদের একাধিক নৃপতি ছিলেন। আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুসারে শূদ্ররা হল আর্য জনসম্প্রদায়সমূহেরই একটি অংশ। ভারতীয় আর্য সমাজে শূদ্ররা ক্ষত্রিয়দেরই একটি অংশ ছিল। শূদ্রদের বেদ পাঠের অধিকার ছিল। শূদ্রদের এই অধিকারের কথা প্রমাণ করার জন্য আমবেদ্‌কার ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি উপাখ্যান উল্লেখ করেছেন। যাইহোক, আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী শূদ্র নৃপতিদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বিরোধ সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই বিবাদ-বিসংবাদের সময় ব্রাহ্মণদের উপর স্বৈরাচারমূলক আচরণ করা হয়েছে

চতুর্থ বর্ণ হিসাবে শূদ্রদের সৃষ্টি

এবং বিবিধ অমর্যাদাকার আচরণ আরোপ করা হয়েছে। এই সময় শূদ্ররা ছিল আসলে ক্ষত্রিয়। এই ঘটনার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে শূদ্রদের বিরুদ্ধে গভীর ঘৃণার সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের উপনয়ন সংস্কারে অস্বীকৃতি জানায়। শূদ্ররা যারা ছিল আসলে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণরা তাদের উপনয়ন করতে অস্বীকার করায়, সামাজিকভাবে তাদের অধোগতি ঘটল। তাদের স্থান হল বৈশ্যদের নীচে। এইভাবে শূদ্ররা চতুর্থ বর্ণ হিসাবে বিবেচিত হল। আমবেদ্‌কার তাঁর *Who were Shudras* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতানুসারে বর্ণভেদ ব্যবস্থা এবং শূদ্রকে নিম্নতম বর্ণের মানুষ হিসাবে প্রতিপন্ন করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে পরবর্তীকালে। সমাজে শূদ্ররা ক্ষত্রিয়-মর্যাদার অধিকারী ছিল। আমবেদকার এ ক্ষেত্রে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ম্যাক্সমুলার, ম্যাক্স ওয়েবার প্রমুখ চিন্তাবিদদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

এই সময় 'শূদ্র' শব্দটি প্রথমে একটি হীন জনগোষ্ঠী অর্থে ব্যবহার করা শুরু হয়। শূদ্র বলতে তাদেরই বোঝান হত যাদের কোন সভ্যতা-সংস্কৃতি নেই এবং মান-মর্যাদার বালাই নেই। অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর মানুষদের বোঝানর জন্য শূদ্র শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। তারপর কালক্রমে ব্রাহ্মণদের বিধি-ব্যবস্থা সূত্রে সহজ-সরল প্রকৃতির আরও অনেক মানুষকে শূদ্রগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমবেদকার বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেছেন— আর্য সমাজব্যবস্থায় সামাজিকীকরণের স্বার্থে বিবিধ সংস্কার কর্মের কথা বলা হয়। এই সমস্ত সংস্কার কর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জাতকর্ম, নামকর্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি। কেবল ব্রাহ্মণরাই এই সমস্ত সংস্কারকর্ম সম্পাদন করতে পারে। সকল আর্য ও অনার্য জনসম্প্রদায়ের জন্য এই সমস্ত সংস্কার কর্মের বিধান ব্রাহ্মণরা দিয়েছে। কিন্তু শূদ্রদের প্রতি ব্রাহ্মণদের ঘৃণার মনোভাব ছিল। তাই শূদ্রদের জন্য ব্রাহ্মণরা এই সমস্ত বিধান দেয় নি।

**শূদ্রদের সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্নকরণ**

শূদ্রদের জন্য এই সমস্ত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে ব্রাহ্মণরা অস্বীকার করে। কোন ব্রাহ্মণ এই সব সংস্কারকর্ম কোন শূদ্র পরিবারে সম্পাদন করলে তার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। যাবতীয় সামাজিক সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার এই সমস্ত সংস্কারকর্ম সম্পাদনের উপর নির্ভরশীল ছিল। স্বভাবতই সমাজে শূদ্রদের ক্ষেত্রে সকল অধিকারকে অস্বীকার করা হয়। হিন্দু সমাজের অপর তিনবর্ণ শূদ্রদের হীনবর্ণ হিসাবে গণ্য করতে শুরু করে। এইভাবে শূদ্রদের সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। সুস্থ সমাজজীবনের স্বার্থে শূদ্রদের কাজকে অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়। মেথরের কাজ, ঝাড়ুদারের কাজ প্রভৃতি কাজকর্মকে সমর্থন করা হয়। অথচ এই সমস্ত কাজ যারা করে তাদের ঘৃণা করা হয়। আমবেদ্‌কার হিন্দু সমাজের এই মানসিকতার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। অধ্যাপক ড. ভর্মা এ বিষয়ে বলেছেন : "Ambedkar has forcefully put forward the view that the Shudras were not dark-skinned aboriginals enslaved or subordinated by the Aryan invaders but they too were Aryans who belonged to the Kshatriya solar dynasty..... The Brahmins were responsible for the degradation of the Shudras. The technique to bring this about was denying the *yajnopavita* to them."

আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী হিন্দু সমাজের অবক্ষয়ের মূল কারণ হল প্রবল জাতিভেদ প্রথা। ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধিক বিচারে সব সময় উন্নত নয়। অথচ তারা সমগ্র সমাজব্যবস্থার উপর আধিপত্য করে আসছে। এই ব্রাহ্মণবাদ বা হিন্দু সমাজের গোঁড়ামী ও আধিপত্যবাদ হিন্দু সমাজে অনৈক্যের সৃষ্টি করেছে এবং অবক্ষয়ের পথ সুগম করেছে। চতুর্বর্ণের বাইরে আছে এক বৃহৎ সংখ্যক জনগোষ্ঠী। এদের অস্পৃশ্য করে রাখা হয়েছে। এই অস্পৃশ্য জনসম্প্রদায়ের জন্য মানবিক অধিকারসমূহ আদায়ের দায়িত্ব আমবেদ্‌কার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। জীবন-ধারণের পরিবেশ-পরিমণ্ডলের উপর ব্যক্তি-মানুষের জীবনের সম্ভাবনাসমূহের বিকাশ নির্ভরশীল। এবং

তদনুসারে ব্যক্তির ভাগ্য নির্ধারিত হয়। অচ্ছুৎ জনগোষ্ঠীকে এক প্রতিকূল পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য করা হয়। তার ফলে তাদের জীবনের সম্ভাবনাসমূহের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুস্থ মানবজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পৌর অধিকারসমূহ থেকে তারা বঞ্চিত হয়; দলিত জীবনযাপনে তারা বাধ্য হয়। এই অস্পৃশ্য জনসম্প্রদায়ের সভ্য জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য পৌর অধিকারসমূহ আদায় করা আবশ্যক, অন্য সকল জনসম্প্রদায়ের সঙ্গে এদেরও সমানাধিকারসম্পন্ন করা দরকার। আর এ সবের জন্য আবশ্যক হল হিন্দু সমাজব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার সাধন বা বৈপ্লবিক রূপান্তর। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমবেদ্‌কার শক্তিশালী সামাজিক সংস্কার আন্দোলন সংগঠনের ব্যাপারে যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেছেন। সত্যিকারের মানবতার জাগরণের জন্য তিনি সতত সক্রিয় ছিলেন। জাত-পাতের বিচারে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে গেছেন। সমাজের অবহেলিত ও অনগ্রসর জনসম্প্রদায়ের মুক্তির আন্দোলনে আমবেদকার ছিল আন্তরিক। গৌতম বুদ্ধের জীবন ও বাণী এক্ষেত্রে তাকে পথ দেখিয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের মানবিকতা ও প্রগতির ধারণা তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে।

সামাজিক সংস্কার আন্দোলন

১৯৩০ সালে বোম্বাই (মুম্বাই) সরকার একটি রাজ্য কমিটি গঠন করে। এই কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল দলিত শ্রেণীসমূহের শিক্ষাগত, সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থা অনুধাবন। আমবেদ্‌কারকে এই কমিটির সদস্য করা হয়। আমবেদ্‌কার এ ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে সুপারিশ করেন। এই সমস্ত সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ দলিত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা; সামরিক বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে তাঁদের নিয়োগের ব্যবস্থা; সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজকর্মে তাদের ব্যাপকভাবে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা প্রভৃতি। আমবেদ্‌কার সর্বভারতীয় দলিত শ্রেণীসমূহের সংস্থার সভাপতি ছিলেন। এই পদাধিকার সূত্রে তিনি ১৯৩০ সালে অনগ্রসর ও অস্পৃশ্য শ্রেণীসমূহের কিছু দাবি-দাওয়ার সাংবিধানিক স্বীকৃতির ব্যাপারে উদ্যোগী হন। তিনি দাবি জানান যে বিভিন্ন সরকারী কমিটিতে এই শ্রেণীর প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্য কথাটির পরিবর্তে হরিজন শব্দটি ব্যবহারের কথা বলেন। গান্ধীজির এই উদ্যোগকে আমবেদ্‌কার সমর্থন করতে পারেন নি। মহাত্মা গান্ধী হরিজন সেবক সংঘ গঠন করেন। এই সংঘ গঠনের উদ্দেশ্য ছিল অস্পৃশ্যতার অপসারণ। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও গান্ধীজির উদ্যোগকে আমবেদ্‌কার সমর্থন করতে পারেন নি। কারণ হরিজন সেবক সংঘের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ছিল বর্ণ হিন্দুরা। তা ছাড়া এই সংঘটি ছিল কংগ্রেস দলেরই একটি অঙ্গ। কংগ্রেসের পক্ষে দলিত শ্রেণীসমূহের সমর্থন সংগ্রহের জন্যই এই সংঘটি গঠিত হয়েছিল। এই অবস্থায় আমবেদ্‌কার 'সমতা সৈনিক দল' নামে স্বতন্ত্র একটি সংস্থা গঠন করেন।

পিছড়ে বর্গের স্বার্থ সংরক্ষণ

ভাইসরয়ের প্রশাসনিক পরিষদের সদস্য হিসাবে আমবেদ্‌কারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ১৯৪২ সালের ২রা জুলাই। ভারতের বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে ঘটনাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যবহ। কারণ এই প্রথম অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের একজন মানুষকে সর্বোচ্চ সরকারী সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হল। সমকালীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সরকারী পর্যায়ের এই স্বীকৃতি অভাবিত। ভাইসরয়ের প্রশাসনিক পরিষদে আমবেদ্‌কারকে শ্রমদপ্তর দেওয়া হয়। এই পদাধিকারসূত্রে শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার জন্য এবং শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য অধিকারসমূহ আদায়ের জন্য তিনি যথাসাধ্য উদ্যোগী হয়েছেন। তা ছাড়া দলিত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যাপারেও আমবেদকার তার এই পদটিকে কাজে লাগিয়েছেন। সর্বোপরি মেহনতি মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্যও তার আন্তরিক উদ্যোগ অনস্বীকার্য।

ভাইসরয়ের প্রশাসনিক পরিষদের সদস্য

আমবেদকার ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ধর্মবিশ্বাস ছিল উদার, মানবিকতাবাদী ও প্রগতিবাদী। তাঁর মতানুসারে ধর্ম মানুষের আচরণে নীতিবোধকে জাগরিত করে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সৌভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি করে। মানবাত্মার মুক্তি সাধনে ধর্মের সদর্থক ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমবেদ্‌কারের ধর্মীয় চেতনা এই পথে প্রসারিত। তিনি ধর্ম বলতে দেবত্ববাদকে বোঝেন নি বা গুরুবাদকে স্বীকার করেন নি। ধর্মের নামে মানবিকতাবোধের অপলাপের তিনি বিরোধিতা করেছেন। হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়িয়েছেন এবং আধিপত্যবাদকে অস্বীকার করেছেন। আমবেদ্‌কারের ধর্মবিশ্বাসের উপাদানসমূহের উপস্থিতি বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতই তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হয়ে উঠেন। এক সময় তিনি বলেছেন যে তিনি জন্মেছেন অস্পৃশ্য হিন্দু হিসাবে। এটা নিতান্তই দুর্ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু হিন্দু হিসাবে মরতে তিনি অপরাগ। স্বভাবতই তিনি হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করেন এবং সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ